জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ১০১ তম

জন্মদিবস ও জাতীয় শিশুদিবস- ২০২১ উদ্‌যাপন উপলক্ষে

†mwgbvi

welq: gvbeZvev`x e½eÜ †kL gwRei ingvb :

GKwU Av_ -mvgvwRK I ivR‰bwZK chv‡jvPbv

Dc¯vcbvq

W. †gv: †jvKgvb fTv

mn‡hvMx Aa¨vcK

ivóªweÁvb wefvM

†bvqvLvjx miKvix K‡jR

মানবতাবাদী বঙ্গবন্ধু : একটি আর্থ -সামাজিক ও রাজনৈতিক পর্যালোচনা

f\gKv: বৃটিশ শাসন-শোষণে নিস্পেষিত ভারতবাসী পরাধীনতার নাগপাশ ছিন্ন করে স্বাধীনতার মুক্ত বাতাসে যখন নিশ্বাস ফেলার জন্য সংগ্রামরত ঠিক তখন ভারতের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত পূর্ব বাংলা প্রদেশের অধিবাসীরাও শোষণ নির্যাতন থেকে মুক্তির জন্য সংগ্রাম মুখর। মুক্তি পাগল সেই পূর্ব বাংলার পদ্মা মেঘনা ও যমুনার পলিমাটি বিধৌত শস্য শ্যামল ফরিদপুর জেলাধীন মহকুমা গোপালগঞ্জের মধুমতি নদীর তীরবর্তী একটি সাধারণ গ্রাম টুঙ্গীপাড়া। শহর থেকে দূরে নিভৃত পল্লির ছায়া ঢাকা এই টুঙ্গীপাড়া গ্রামে সম্ভ্রান্ত মধ্যবিত্ত মুসলিম পরিবারে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম গ্রহন করেন। দিনটা ছিল ১৭ মার্চ ১৯২০ খ্রিস্টাব্দ (বাংলা ২০ চৈত্র, ১৩২৭ সন), মঙ্গলবার, সময় রাত ৮টা পৃথিবীর আলোয় দু'চোখ মেলে তাকানোর মুহুর্ত থেকে এ শিশুটিকে তার জনক জননি সানন্দে ÔLvKvÕ নামে ডাকতে শুরু করেন। শৈশবে কৈশোরের সাথীরা সম্বোধন করতো তাকে ***'মুজিব'*** বলে বড় হওয়ার পর সহকর্মী বন্ধুরা বলতেন ***'মুজিব'*** ভাই। বঙ্গবন্ধুর পারিবারিক বন্ধন ছিল অত্যন্ত সুদৃঢ়। পিতা শেখ লুৎফুর রহমান ও মাতা সায়েরা খাতুন ছিলেন তাঁর অনুপ্রেরণার উৎস। দাম্পত্য সঙ্গী বেগম ফজিলাতুন্নেসা (যাকে তিনি রেনু বলে ডাকতেন) ছিলেন তাঁর সুদীর্ঘ ৪৬৮২ দিন কারাবাসকালিন সময়ের নিবৃত সহচর ও রাজনৈতিক সংগ্রামী জীবনের একনিষ্ঠ পরামর্শদাতা। ব্যক্তিগত জীবনে ২ কন্যা ও ৩ পুত্রের জনক বঙ্গবন্ধুর পারিবারিক জীবন যখন শুরু হয় তখন শেখ মুজিবুর রহমানের বয়স ছিল ২২ বছর ও রেনুর বয়স ছিল ১২ বছর। পিতা-মাতা, স্ত্রী, কন্যার প্রতি বঙ্গবন্ধুর ছিল অপরিসীম মমত্ববোধ। প্রথম সন্তান বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে তিনি অত্যন্ত আদর করতেন ও হাসু বলে সম্বোধন করতেন। কারাগারের নির্জন প্রকোষ্ঠে থাকাকালিন সময়ে বঙ্গবন্ধুর লিখা ***'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'***তে রেনুর প্রতি তাঁর অপরিসীম ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাবোধের নিদর্শন ফুটে উঠে।

জন্মমুহুর্তে বাবা মা ও আত্মীয়স্বজন-পরিজনদের কেউ কি ভাবতে পেরেছিলেন খোকা বড় হয়ে মানবতার জয়গান গাইবেন? জননন্দিত রাজনীতিবিদ হবেন? বঙ্গবন্ধু নামে সারা বিশ্বে সমাদৃত হবেন?

বিশ শতকে ষাটের দশকের শেষভাগে যখন পূর্ব বাংলার নগরে বন্দরে গ্রামে-গঞ্জে জনপ্রিয় নেতা হিসেবে তাঁর নামে শ্লোগান উঠতো-'তোমার ভাই, আমার ভাই-মুজিব ভাই, মুজিব ভাই'- অথবা 'তোমার নেতা, আমার নেতা, শেখ মুজিব, শেখ মুজিব'। তখন কি কেউ বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর নেতৃত্বেই বাঙালি স্বাধিকার আন্দোলন-সংগ্রাম ধাপে ধাপে একদিন মুক্তি সংগ্রামের মোহনায় পৌছে স্বাধীনতা অর্জনে সক্ষম হবে।১

প্রসঙ্গত ভারতীয় উপমহাদেশে বাঙালি জাতির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে গোখলের বিখ্যাত উক্তি, বঙ্গবন্ধুর ক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য।

গোখলে বলেছিলেন, ***what Bengal thinks today, India thinks tomorrow.*** *2*

শিশুকাল থেকে বঙ্গবন্ধু ছিলেন ডানপিটে ও একরোখা স্বভাবের বলে ভয়ভীতি আদৌ ছিল না। অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সত্য ও উচিত কথা বলার অভ্যাস থাকায় কারো সামনেই তিনি কথা বলতে ভয় পেতেন না।

তিনি একাধারে ছিলেন মানব দরদী, সাহসী ও নির্ভীক। বিপদে আপদে অকুণ্ঠ চিত্তে দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ছিল বঙ্গবন্ধুর জীবনের অন্যতম লক্ষ্য।

বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে আমাদের জানতে হলে, বিশেষ করে তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারা এবং কর্মকান্ডের উৎস খুঁজতে হলে, তাঁর নিজের লেখা ডায়েরি যার উপর ভিত্তি করে ২টি বই প্রকাশিত হয়েছে, ‘*Amgvß AvZ¥Rxebx*Õ (২০১২) এবং ‘***কারাগারের রোজনামচা’ (2017)*** তাই হল সবচেয়ে মূল্যবান সূত্র।

অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে তিনি তাঁর ছোটবেলার, যৌবনের জীবনদর্শন এবং রাজনীতি সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় তার অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে ১৯৫০ এর পরের দশকের পরের ঘটনার বিবরণ নেই, হয়তোবা সেই নোটবই গুলো খুঁজে পাওয়া যায়নি কিন্তু অসমাপ্ত হলেও এই বইটি থেকে তাঁর রাজনৈতিক ধ্যান ধারণাটি খুব পরিস্কার ভাবে বুঝা যায়। অন্য বইটি *ÔKviviMv‡ii †ivRbvgPvÕ* ও তাঁর ডায়েরি ভিত্তিক । ১৯৪৮ থেকে শুরু করে ১৯৭১ পর্যন্ত দীর্ঘ ২৩ বৎসর নানা সময় তাকে কারাবরণ করতে হয়েছে। এই বইটিতে ১৯৬৬ সালের ঐতিহাসিক ৬ দফা আন্দোলনের সময়ের তাঁর কারাগারের দিনগুলোর বিশদ বিবরণ আছে। এখানে ও তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারা সুস্পষ্ট। বিশেষ করে স্বৈরাচারী সরকার জনগনের আন্দোলনকে দমন করার জন্য যত রকমের নিপীড়ন দমন করতে পারে, তার বিশদ বর্ণনা তাঁর এই ডায়েরীতে। এছাড়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় ব্যাক্তি স্বাধীনতা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা কত প্রয়োজনীয় তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা বইটির বিভিন্ন স্থানে আমরা দেখতে পাই।

বঙ্গবন্ধু রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন একজন সাধারণ কর্মী হিসেবে কিন্তু খুব অল্পসময়ের মধ্যে হয়ে ওঠেন কোটি কোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা। একদিকে তার ছিল অসাধারণ সাংগঠনিক ক্ষমতা, অন্যদিকে অতুলনীয় বাগ্মীতা। সাধারণত একই ব্যক্তির মধ্যে আমরা এই দুই গুণের সমাহার দেখিনা। মাত্র তিনটি বাক্যেই বঙ্গবন্ধু তাঁর আত্ম পরিচিতি ও মূল্যবোধ অত্যন্ত পরিষ্কার করেছেন। *Amgvß AvZ¥Rxebxi* প্রথমেই বঙ্গবন্ধুর একটি উদ্বৃতি রয়েছে যা তিনি ১৯৭৩ সালে ৩০ শে মে মাসে লিখেছেন। তিনি লিখেছেন ;

‘একজন মানুষ হিসেবে সমগ্র মানব জাতি নিয়ে আমি ভাবি। একজন বাঙালি হিসেবে যা কিছু বাঙালির সঙ্গে সম্পর্কিত তাই আমাকে গভীর ভাবে ভাবায়। এই নিরন্তর সম্প্রীতির উৎস ভালোবাসা, অক্ষয় ভালোবাসা যে ভালোবাসা আমার রাজনীতি এবং অস্তিত্বকে অর্থবহ করে তোলে। ৩

এই উদ্বৃতি থেকে এটা স্পষ্ট যে, বঙ্গবন্ধু নিজেকে একাধারে মানুষ এবং তার সঙ্গে বাঙালি হিসেবে আত্মপরিচয় স্বীকৃতি দিচ্ছেন। তাঁর কর্মপ্রেরণার উৎস হিসেবে চিহ্নিত করেছেন বাঙালি এবং মানব সম্প্রদায়ের জন্য তাঁর অফুরন্ত ভালবাসা। এই আত্মপরিচয় থেকেই আমরা উপলব্ধি করতে পারি **Zvi *রাজনৈতিক চিন্তাধারার চারটি বৈশিষ্ট্য লক্ষনীয়, বাঙালি জাতিসত্তা, মানবপ্রীতি, অসাম্প্রদায়িকতা এবং সমাজতন্ |***

- **gvbeZvev` ej‡Z Avgiv wK ewS?**

gvbeZvev`:

রেনেসাঁ এর শ্রেষ্ঠ অবদান হলো মানবতাবাদ। মানবতাবাদের মূল কথা হলো, মানুষের প্রতি ভালোবাসা বা মানুষের মঙ্গল কামনা করা। প্রাচীন গ্রিক ও রোমান সাহিত্য, দর্শন, শিল্প বিজ্ঞান প্রভৃতি চর্চার ফলে মানুষ বুঝতে শুরু করে যে, এ জগৎ আনন্দময় এবং দেহ ও মনের উন্নতি সাধনই হলো জীবনের উদ্দেশ্য। মানুষের মনের এই নতুন চিন্তাধারার ফলে উদ্ভব হয় নবজাগরণের মানবতাবাদীর দিক। এ যুগে মানবতাবাদীরা পৌরাণিক চিন্তার পরিবর্তে ইহ জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ বৃদ্ধি ও প্রেম ভালোবাসার কথা প্রচার করতে থাকেন। তারা মানব জীবনের উন্নতির উপর গুরুত্ব দিয়ে সাহিত্য ও শিল্পকলায় মানুষের জীবনকে ভিত্তি করে বিভিন্ন সৃষ্টিকর্মকে সমর্থন জানান।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন মানবতার মহান দূত। তিনি আজীবন মানুষের জীবন ও জীবিকার জন্য সংগ্রাম করে গেছেন। বাংলার মানুষের উপর ব্রিটিশ ও পশ্চিম পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠির শাসন ও শোষণ নিষ্পেশনের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন স্বোচ্ছার। বাংলার মেহনতি, দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো ছিল তাঁর রাজনীতির মূল লক্ষ্য। নিম্নের ঘটনা প্রবাহ থেকে বঙ্গঁবন্ধু শেখমুজিবুর রহমানের জীবনের মানবহিতোষী কর্মকান্ডের প্রমাণ পাওয়া যায়।

একবছর প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ভালো ফসল না হওয়ায় টুঙ্গিপাড়া এলাকায় প্রায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। গাঁয়ের অধিকাংশ মানুষ অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটাতে বাধ্য হয়। মুজিব গোপালগঞ্জ শহর থেকে টুঙ্গিপাড়ায় এসে এসব ঘুরে ঘুরে দেখলেন । তারপর পিতার অনুপস্থিতিতে তাদের গোলায় সঞ্চিত ধান অতি অভাবগ্রস্ত মানুষের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছিলেন।

> *পিতা ফিরে এসে শুনলেন এবং দেখলেন মুজিব এসে অকপটে পিতাকে বললেন অভাবগ্রস্থ মানুষের কষ্ট সহ্য করতে না পেরে তিনি নিজেদের গোলার বাড়তি ধান তাদের মধ্যে বিতরণ করেছেন, তাদের বাঁচার ব্যবস্থা করেছেন। ৪*

কিশোর বয়সে বঙ্গবন্ধুর চরিত্রে গরিবের বন্ধু চরিত্রটি ফুটে উঠে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তখন গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্র। তিনি স্কুলের শিক্ষক রসরঞ্জন সেনগুপ্তের বাড়িতে প্রাইভেট পড়তে যেতেন। একদিন পড়া শেষ করে বাড়ি ফিরে আসার পথে খালি গায়ে এক বালককে দেখে নিজের গায়ের চাদর পরিয়ে দিয়ে বাড়ি ফিরেন আদুল গায়ে। বালকের কষ্ট কিশোর মুজিব সেদিন সহ্য করতে পারেননি। সেদিনও বাড়ি ফিরে পিতাকে অকপটে কথাটি খুলে বলেছিলেন গরীব ছাত্রদের দু:খ কষ্টের কথা। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে স্কুলে বঙ্গবন্ধুর ছাতা হারিয়ে যেত। অবশেষে দেখা যায় তাঁর এসব ছাতা হারানোর বিষয়টি ছিল অনেকটা ইচ্ছাকৃত, গরীব ছাত্রদেরকে বর্ষাকালে ছাতা দান করাই ছিল তাঁর মূল লক্ষ্য। ৫

ছাত্রাবস্থায় শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন অকুতোভয় চরিত্রের অধিকারী। ১৯৩৮ সালের ১৬ জানুয়ারি বাংলার প্রধানমন্ত্রী শেরে বাংলা এ.কে ফজলুল হক এবং বাণিজ্য ও পল্লি উন্নয়নমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী গোপালগঞ্জ পরিদর্শনে আসেন। কংগ্রেস মন্ত্রীদের আগমনে বাধার সৃষ্টি করে। শেখ মুজিবর রহমান ছাত্রদের নিয়ে সংবর্ধনার পক্ষে কাজ করেন। স্কুল প্রাঙ্গনে সভা শেষে মাননীয় দুই অতিথি তাদের আবাসস্থল ডাকবাংলায় ফিরছিলেন। সাথে স্কুলের সর্বজন শ্রদ্ধেয় প্রধান শিক্ষক বিলাসবাবু ও অপরাপর স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। কিশোর মুজিব কয়েকজন সাথীকে নিয়ে অতিথিদের পথরোধ করে দাড়ান। প্রধান শিক্ষক ঘাবড়ে গেলেন, তারই ছাত্ররা মন্ত্রীদের সঙ্গে বেয়াদবি করছে। তিনি মুজিবকে সামনে থেকে সরে যাবার বৃথা চেষ্টা করলেন কিন্তু মুজিব ও তাঁর সঙ্গীরা অনড় মন্ত্রীদের কাছে দাবি না জানিয়ে তারা পথ ছাড়বেন না। শেরে বাংলা এ.কে ফজলুল হক ও শহীদ সোহরাওয়ার্দী দুজনেই অবাক হয়ে মুজিবকে দেখলেন এবং শেষে জানতে চাহিলেন কি তারা বলতে চায়। অকুতোভয় মুজিব মন্ত্রীদের সামনে এগিয়ে গিয়ে তাঁদের হোষ্টেলের ভাঙ্গা ছাদের কথা এবং তা দিয়ে পানি চুইয়ে তাদের বই খাতা ও বিছানাপত্র সব সময় নষ্ট হয়ে যাবার কথা বললেন এবং এও বললেন যে, হোস্টেলের ছাদ মেরামত করার না গেলে তারা মন্ত্রীদের পথ ছাড়বেন না। অবশেষে মুজিবের কথামতোই হোস্টেলের ছাদ মেরামতের খরচ হিসেবে শেরে বাংলা তাঁর ঐচ্ছিক তহবিল থেকে বারশ টাকা মঞ্জুর করলেন। ঘটনার এখানেই সমাপ্তি ঘটেনি।

ডাকবাংলায় ফিরে উভয়মন্ত্রী এই সাহসী কিশোর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং পরে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী লোক পাঠিয়ে মুজিবকে ডাকবাংলায় ডেকে নিয়ে তার সাথে আলাপ করেন। এই হলেন কিশোর মুজিব-ভবিষ্যতের সম্ভাবনাময় এক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের দৃঢ়চেতার অনুকরনীয় ঘটনা। ৬

বঙ্গবন্ধু ১৯৩৭ সালে তাঁর শিক্ষক কাজী আবদুল হামিদ এম.এস.সি কর্তৃক পরিচালিত মুসলিম সেবা সমিতির সদস্য হন। অন্যান্য ছাত্রদের সাথে বঙ্গবন্ধু মুষ্ঠি ভিক্ষার চাল উঠাতেন এবং গরীব ছাত্রদের সাহায্য করতেন। ***প্রত্যেক রবিবার ছাত্ররা পালাক্রমে বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাল উঠিয়ে আনতেন এবং এ চাল বিক্রি করে গরিব ছেলেদের বই ও পরীক্ষার ব্যয় বহন করা হত। পাড়ায় ঘুরে ঘুরে বঙ্গবন্ধু গরীব ছাত্রদের জায়গির থাকার ব্যবস্থা করে দিতেন।*** ৭

দাওয়ালদের অধিকার রক্ষায় বঙ্গবন্ধু সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেন। এক সময় ফরিদপুর, ঢাকা জেলার লোক, খুলনা ও বরিশাল জেলায় ধান কাটার জন্য মৌসুমে দলবেধে দিন মজুর হিসেবে যেত। এরা ধান কেটে ঘরে উঠিয়ে দিত ও পরিবর্তে ধানের একটি অংশ পেত। এদের 'দাওয়াল' বলা হত। হাজার হাজার লোক নৌকা করে যেত, আসবার সময় তাদের ধানের অংশ নিজেদের নৌকা করে বাড়িতে নিয়ে আসত। এভাবে কুমিল্লা জেলার `vIqvjiv সিলেট জেলা যেত। সরকার হঠাৎ কর্তন প্রথা চালু করে। যাতে করে একজেলা থেকে অন্য জেলায় খাদ্য যেতে না পারে। ফরিদপুর, ঢাকা ও কুমিল্লা জেলার হাজার হাজার লোক ধান কাটার জন্য খুলনা বরিশাল ও সিলেট জেলায় গেল সরকার কোন বাধা দিলনা। যখন তারা দুইমাস পর ধান কেটে তাদের প্রাপ্য অংশ নিয়ে নিজ জেলায় উদ্দেশ্যে রওয়ানা হল তখন সরকার তাদের বাধা দিল।

ধান নিতে পারবেনা, সরকারের হুকুম ধান জমা দিয়ে যেতে হবে নতুবা নৌকা সমেত আটক ও বাজেয়াপ্ত করা হবে। দাওয়ালরা কি শেষ সম্বল দিতে চায়? শেষ পর্যন্ত সমস্ত ধান নামিয়ে রেখে লোকগুলোকে ছেড়ে দেয়া হয়। দাওয়ালদের মা-বোন, স্ত্রী সন্তানদের খাবারের জন্য পথ চেয়ে বসে আছে, আর কোন মতে সংসার চালাচ্ছে কখন তাদের স্বামী, ভাই, বাবা, ফিরে আসবে ধান নিয়ে। ৭

এই খবর পেয়ে **e½eÜ** ব্যথিত হলেন, তিনি `vIqvj‡`i পক্ষ অবলম্বন করলেন। সভা সমিতি করলেন, আলাপ আলোচনার শুরু করলেন কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে। কোন ফল হলো না। সরকার নিজেও জানত `vIqvjiv ধান না কাটলে খুলনা জেলায় অর্ধেক ধান জমিতে পড়ে থাকবে। অবশেষে আন্দোলন সংগ্রামের পর ১৯৪৮ সালের শেষের দিকে সরকার হুকুম দিল `vIqvj‡`i‡K নিকটতম খাদ্য গুদামে ধান জমা দিতে হবে এবং সেই গুদাম থেকে কর্মচারীরা একটি রশিদ দিবে, `vIqvjiv দেশে ফিরে এসে সেই পরিমান ধান নিজের জেলার নিকটতম গুদাম থেকে সংগ্রহ করবে। পরে দেখা গেল সাদা কাগজ লেখা দিয়েই ধান নামিয়ে রাখত। সেই রশিদ নিয়ে দেশের গুদামে গেলে গালাগালি করে তাড়িয়ে দিত। এতে দাওয়ালরা ঋণের ভারে জর্জরিত হয়ে সর্বশান্ত হয়ে গেল।

পাকিস্তান শুরুর প্রাক্কালে জিন্নাহ ফান্ড নামে সরকার একটি ফান্ড খোলে। যে যা পারে দান করবে এ হল হুকুম। জিন্নাহ ফান্ডে টাকা দিতে কারো আপত্তি ছিলনা। যাদের অর্থ আছে তারা খুশি হয়ে বেশি দান করছে। অনেক গরিব ও জিন্নাহ ফান্ডে টাকা দিয়েছে।

কিন্তু কিছু সংখ্যক অফিসার অতি উৎসাহী হয়ে ভালো প্রমোশনের আশায় প্রতিযোগিতা করে ফান্ড আদায়ে জোর জবরদস্তি শুরু করল। গোপালগঞ্জ মহকুমায় খাজা সাহেব আসবেন। তাই হাকিম সাহেব অভ্যর্থনা কমিটি গঠন করেছেন এবং ৬ লক্ষ লোকের মাথা পিছু একটাকা করে চাঁদা উঠানোর নির্দেশ দিলেন। তিনি সমস্ত ইউনিয়ন বোর্ডে হুকুম দিলেন চাঁদা দিতে হবে। যারা চাঁদা দিবে না তাদের শাস্তি ভোগ করতে হবে। চৌকিদার দফাদার নেমে পড়েছে। কারও গরু, কারও বদনা, থালা, ঘটিবাটি কেড়ে আনা হচ্ছে। এক ত্রাসের রাজত্ব। এখবর বঙ্গবন্ধু শুনে বসে থাকতে পারলেন না। গোপালগঞ্জে যাবার পথে নৌকার মাঝি বঙ্গবন্ধুকে বললেন, "পাকিস্তানের কথা তো আপনার মুখে শুনেছি, এই পাকিস্তান আনলেন। "বঙ্গবন্ধু বললেন, "এটা পাকিস্তানের দোষ না।"৮

মহকুমা হাকিম ও মুসলীমলীগ এডহক কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে এ টাকা থেকে যে টাকা অভ্যর্থনার জন্য খরচ হবে অবশিষ্ট টাকা খাজা সাহেবকে তোড়ায় করে দেয়া হবে জিন্নাহ ফান্ডের জন্য।

বঙ্গবন্ধু সিদ্ধান্ত দিলেন, এ টাকা নিতে দেয়া হবেনা। তার অভ্যর্থনায় যা ব্যয় হয়, তা বাদে বাকী টাকা মসজিদ আর গোপালগঞ্জে কলেজ করার জন্য রেখে দিতে হবে। এর ব্যতিক্রম হলে তিনি বাধা দিবেন।

এ খবর শুনার পর সমস্ত মহকুমায় প্রায় টাকা তোলা বন্ধ হয়ে গেল। অবশেষে জিন্নাহ ফান্ডের নামে টাকা তোলা হয়েছিল বলেই অবশিষ্ট টাকা দিয়ে গোপালগঞ্জে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর নামেই কলেজ করা হয়েছিল।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তিনি ছিলেন শ্রমজীবি ও কর্মজীবি মানুষের পরমবন্ধু। তিনি ১৯৪৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪র্থ শ্রেনীর কর্মচারীদের আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। পাকিস্তান হওয়ার পূর্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রেসিডেন্সিয়াল বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। ছাত্র অনেক বেড়ে গিয়েছিল, কর্মচারীর সংখ্যা বাড়েনি। তাদের সারাদিন ডিউটি করতে হয়। পূর্বে বাসা ছিল এখন তাদের বাসা প্রায়ই নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কারণ নতুন রাজধানী হয়েছে তাদের বাড়ী ঘরের অভাব। পূর্বে তা পোশাক পেত পাকিস্তান হওয়ার পর তাদের পোশাক দেয়া হয়না। চাকরির নিশ্চয়তা নেই যখন খুশী তখন তাড়িয়ে দিত, ইচ্ছামত চাকুরী দিত। বঙ্গবন্ধু তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। কর্মচারীরা এসব বিষয় তাকে অবহিত করে। কর্মচারীরা ধর্মঘট শুরু করে ও সাধারণ ছাত্ররা এর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করল। কর্মচারীরা উপয়ান্ত না দেখে শোভাযাত্রা বের করল। বঙ্গবন্ধু তৎকালীন ফজলুল হক হল, সলিমুল্লাহ হলের ভিপিসহ, ভাইস-চ্যান্সেলর সাহেবের সাথে দেখা করলেন এবং তাদের ন্যায্য দাবী উপস্থাপন করলেন।

তিনি ভাইস চ্যান্সেলর মহোদয়কে বললেন, ***"আপনি আশ্বাস দেন, ওদের ন্যায্য দাবী কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আদায় করে দিতে চেষ্টা করবেন এবং কাউকেও চাকরি থেকে বরখাস্ত করবেন না এবং কারো বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন না।***

ভাইস চ্যান্সেলর আশ্বস্ত করলেন কর্মচারীদের বরখাস্ত বা অপসারণ করা হবেনা কিন্তু পরবর্তীতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের দেয়া ওয়াদা রক্ষা করেনি। নির্দিষ্ট টাইম অর্থাৎ পরের দিন ১২ টার মধ্যে যারা এসেছে তাদেরকে কাজে যোগদান করার অনুমতি দিয়েছে, যারা দূরদুরান্ত থেকে দেরিতে এসেছে তাদেরকে কাজে যোগদানের অনুমতি দেননি। ছাত্ররা ধর্মঘট অব্যাহত রাখতে চাইলে কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষনা করেন। এই ঘটনায় বঙ্গবন্ধুসহ ২৭ জন ছাত্রকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৪৯ সালের ১৮ এপ্রিল বহিষ্কার করে এবং গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠিয়ে দেয়া হয়। জেলে থাকাকালে সরকার তাঁকে জরিমানা ও মুচলেকার প্রস্তাব দেয় এবং জানায় তিনি যদি রাজনীতি না করেন, তাহলে ছাত্রত্ব ফিরিয়ে দেয়া হবে। তিনি সরকারী প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে শেখ মুজিব টুঙ্গিপাড়ায় গ্রামের বাড়িতে চলে যান।

তাঁর পিতা তাকে লন্ডনে গিয়ে ব্যারিস্টারি পড়তে অনুরোধ করেন কিন্তু শেখ মুজিব তত দিনে পাকিস্তানের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত বুঝে ফেলেন। তিনি বাংলার জনগণকে পাকিস্তানের শোষণের মধ্যে ফেলে রেখে লন্ডনে গিয়ে পড়তে চাইলেন না। তিনি রাজনীতি করেই বাংলার মানুষের দাবি আদায়ের দাবিতে আবার ঢাকায় চলে এলেন। এখানেই তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা জীবনের ইতি ঘটে। [১০]

কলকাতায় শেখ মুজিবুর রহমান ছাত্র জীবন থেকে বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। তার জীবনের স্মৃতি বিজড়িত কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ (বর্তমানে মাওলানা আবুল কালাম আজাদ

কলেজ) তখন ছিল মুসলিম ছাত্রদের অন্যতম আশ্রয়স্থল। বঙ্গবন্ধু ইসলামীয়া কলেজে দুইবার বিনা প্রতিদ্বন্দিতায় সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হন। বেকার হোস্টেলের ২৪ নং কক্ষে তিনি থাকতেন। তার মাসিক খরচ বাবদ পিতার কাছ থেকে যে ৭৫ (পঁচাত্তর) টাকা পেতেন তা তার গরীব বন্ধুদের সাথে ভাগাভাগি করতেন।

একই কক্ষে থাকতেন আরও একজন তার গোপালগঞ্জের স্কুল জীবনের একজন সহপাঠী নাম শাহাদাৎ হোসেন। তার বাড়ি টুঙ্গি পাড়ার নিকটস্থ গিমাডাঙ্গা, বাবার নাম বচন মিয়া- একজন ভূমিহীন ক্ষেত মজুর। বঙ্গবন্ধুর পিতা থেকে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে অন্যান্য বন্ধুসহ সারা মাস চলতেন। ১১

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় বঙ্গবন্ধু আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। ১৯৪৬ সালে কলকাতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন তিনি। তরুন শেখ মুজিব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ব্যক্তিত্বকে তাঁর জীবনের পথ প্রদর্শক হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট ভারত বিভক্তির পরপরই কলকাতায় শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ব্রিটিশ সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করে সেই স্থানে শিখ সৈন্যদের নিয়োগ করা হয়।

হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত কিছু লোক এ অবস্থার সুযোগ নিয়ে কলকাতায় মুসলিম বসতিপূর্ণ কিছু কিছু এলাকায় পরিকল্পিতভাবে হামলা শুরু করেন। সে সময় ভারত ও পাকিস্তানে উভয় স্থান থেকে বিপুল সংখ্যক ভীত সন্ত্রস্ত জনতা গমনাগমন করতে থাকে। কলকাতার মুসলমান সম্প্রদায় আরও এক ভয়াবহ আতঙ্কজনক পরিস্থিতির মধ্যে বাস করতে থাকেন। নোয়াখালীতে দাঁঙ্গা শুরু হওয়ার অজুহাত দেখিয়ে বিহার প্রদেশের বিভিন্ন জেলার মুসলমানদের উপর পরিকল্পিতভাবে আক্রমন চালায়। এ সময় মহাত্মা গান্ধীর অনুসারীরা শ্লোগান দিতে থাকল, মুসলমানকো মাত মারো, বাপুজী অনশন কারেগা। ১২

গান্ধীজী, সোহরাওয়ার্দীর সাথী হয়ে বঙ্গবন্ধু, দাঙ্গা উপদ্রুত এলাকা পরিদর্শন করেন মুসলমানসহ অসহায় মানুষের জীবন ও সম্পত্তি ক্ষয়ক্ষতি দেখে মর্মাহত হন। তারা ভারত ও পাকিস্তান উভয় অংশে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় যাতে সংখ্যালঘুদের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধু, গান্ধীজী ও সোহরাওয়ার্দী, পশ্চিমবঙ্গের অপরাপর অঞ্চল, ব্যারাকপুর নারকেল ডাঙ্গা পূর্বপাঞ্জাব, আলওয়ার, ভরতপুর দিল্লী ও যুক্ত প্রদেশে বিভিন্ন স্থানে শান্তি সভা করেন।

বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক থাকাকালীন সময়ে ১৯৫৫ সালের ২২ অক্টোবর আওয়ামীলীগকে অসাম্প্রদায়িক দল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য "আওয়ামী মুসলিম লীগ" থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দিয়ে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে পাকিস্তানের সমগ্র নাগরিকদের জন্য দলটির সদস্যপদ উন্মুক্ত করে দেন। ১৩

mv¤ú`wiqKZv †hb gv_v Pvov w`‡q DV‡Z bv cv‡i †mRb¨ e½eÜ e‡jb, ধর্মনিরপেক্ষ *evsjv‡`‡k, gmjgvb Zvi agKg Ki‡e| wn›` Zvi agKg Ki‡e, †eS× Zvi agKg Ki‡e| †KD KvD‡K evav w`‡Z cvi‡e bv|* ১৪

সারা বাংলাদেশে ১৯৫৩ সালে কাদিয়ানীদের দাঙ্গায় তিনি নিন্দা করেছেন। ধর্ম নিয়ে রাজনীতির বিপক্ষে ছিলেন তিনি। ১৯৫৪ সালে নারায়নগঞ্জে আদমজি পাটকলে বাঙালি-অবাঙালি দাঙ্গা যাতে

বিস্তৃত না করে তার জন্য তিনি কাজ করেন। ১৯৬৪ সালে ভারতে হিন্দু মুসলীম দাঙ্গার পর তিনি দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি গঠন করেন এবং ***'পূর্ব পাকিস্তান রুখে দাড়াও'*** শিরোনামে বহু প্রচারপত্র বিলি করেন।

১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ভাষণেও তিনি জনগণকে সতর্ক করে বলেন: মনে রাখবেন শত্রু বাহিনী ঢুকেছে, নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটপাট করবে। এই বাংলায় হিন্দু মুসলমান, বাঙালি-অবাঙালি যারা আছেন তারা আমাদের ভাই, তাদের রক্ষার দায়িত্ব আপনার ওপরে আমাদের যেন বদনাম না হয়। ১৫

বঙ্গবন্ধু আজীবন নিজেকে আর্তমানবতার সেবায় বিলিয়ে দিয়ে গেছেন। ১৯৪৩ সালে উপমহাদেশে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয়। লক্ষ লক্ষ লোক মারা যায়। সোহরাওয়ার্দী সাহেব তখন সিভিল সাপ্লাই মন্ত্রী। গ্রাম থেকে লাখ লাখ লোক শহরে ছুটছে স্ত্রী পুত্রের হাত ধরে। খাবার নাই, কাপড় নাই। ইংরেজরা যুদ্ধের জন্য নৌকা বাজেয়াপ্ত করেছে। ধান, চাল সৈন্যদের খাওয়ার জন্য গুদাম জব্দ করেছে। ফলে এক ভয়াবহ অবস্থা সৃষ্টি হয়। এমন দিন তাই রাস্তায় লোক মরে পড়ে থাকতে দেখা যায় না।

বঙ্গবন্ধু এসময় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সহায়তায় লেখাপড়া ছেড়ে লঙ্গরখানা খুলে মানুষকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেন। ১৬

১৯৭০ সালের দেশের দক্ষিণাঞ্চলে প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড়ে আঘাত হানলে বঙ্গবন্ধু নির্বাচনী প্রচারণা বন্ধ রেখে আর্তমানবতার সেবায় এগিয়ে আসেন এবং জনগণের মাঝে ত্রাণ বিতরণ শুরু করেন। এ ঝড়ের কারণে প্রায় ৫ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারায়। পাকিস্তানি সামরিক সরকারে এমন ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পরও জরুরি ত্রাণকার্য পরিচালনায় গড়িমসি করে। ঘূর্ণিঝড়ের পর যারা বেঁচে ছিলেন তাদের অনেকেই পানীয় জলের অভাবে মারা যায়। যার ফলশ্রুতিতে দেখা যায় ১৯৭০ সালের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের জনগন বাংলাদেশ আওয়ামীলীগকে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করে।

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রমনায় অবস্থিত রেসকোর্স ময়দানে (**eZgv‡b †mvnivIqv`x D`¨vb)** অনুষ্ঠিত ঐতিহাসিক জনসভায় ১৮ wgwb‡Ui fvl‡Y gvbeZvi RqMvb *লক্ষ্য* **Kiv hvq|**

e½eÜ e‡jb, ***আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না। আমরা এদেশের মানুষের অধিকার চাই। তিনি আরও বলেন, গরীবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে, সে জন্য সমস্ত অন্যান্য জিনিসগুলো আছে সেগুলির হরতাল; কাল থেকে চলবে না। রিকশা, গরুর গাড়ি চলবে, রেল চলবে, লঞ্চ চলবে।*** *wZwb `xß K‡Ú Avi I e‡jb, যে সমস্ত লোক শহীদ হয়েছে, আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, আমরা আওয়ামী লীগের থেকে যদ্দুর পারি তাদের সাহায্য করতে চেষ্টা করবো। যারা পারেন আমার রিলিফ কমিটিতে সামান্য টাকা পয়সা পৌঁছিয়ে দেবেন। আর এই সাতদিন হরতালে যে সমস্ত শ্রমিক ভাইরা যোগদান করেছেন, প্রত্যেকটা শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌঁছায়ে দেবেন।* **17**

- **e½eÜi Rbm¤úxwZ: RbM‡Yi ivRbxwZ**

পৃথিবীতে বহু বড়মাপের নেতা আছেন যাদের জনগণের সাথে সম্পৃক্ততা নেই বললেই চলে। তাঁরা অনেক সময় থেকে যান জনগণের উর্ধ্বে। বঙ্গবন্ধু এর ব্যতিক্রম। তিনি সবসময়ই বাংলাদেশের জনসাধারণের সঙ্গে নিজকে এক করে দেখতেন এবং তাই তিনি বারেবারে একদিকে তার জনগণের জন্য ভালোবাসা এবং অন্য দিকে জনগণের তাঁর জন্য ভালবাসার কথা উল্লেখ করতেন।

পৃথিবীর বিভিন্ন নেতাদের ভাষণ যখন আমরা পড়ি এবং তাদের ভাষণের সাথে আমরা বঙ্গবন্ধুর ভাষণ তুলনা করি তখন আমাদের কাছে তাঁর একটি অভিব্যক্তি, *ÒRbM‡Yi cwZ fv‡jvevmvÓ* তা অনন্য বলে মনে হয়েছে। এই ভালোবাসাই সৃষ্টি করেছিল জনগণের সঙ্গে তাঁর নাড়ির টান। তিনি জানতেন জনগণ তাঁর উপর অসীম আস্থা রাখে এবং তিনিও সবসময় সজাগ থাকতেন যেন তাঁর কোন কর্মকান্ডে এই আস্থার স্থানটি ক্ষুন্ন না হয়। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশে আসার পর এক জনসভায় তিনি বলেন;

বাংলার মানুষকে আমি জানি। আমাকে ও বাংলার মানুষ চেনে। বাংলার মানুষকে আমি ভালোবাসি। বাংলার মানুষ আমাকে ভালোবাসে। আমি তাদের জন্য কোন কাজে হাত দিলে হাল ছাড়ি না। ১৮

জনসাধারণের ইস্যু নিয়ে তিনি কথা বলতেন রাজনীতি করতেন। আমরা দেখতে পাই যখন তিনি পাকিস্তান আন্দোলনের সাথে যুক্ত তখন তিনি দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষের জন্য হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সহযোগিতায় লঙ্গরখানা খুলে কাজ করেছেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর যখন দেশে খাদ্যের অভাব তখন তিনি সুষম খাদ্য বন্টনের আন্দোলন, ভুখা মানুষের মিছিলে অংশগ্রহণ করেন।

তাঁর লেখায় আমরা দেখতে পাই দেশে বন্যা কিংবা খাদ্যাভাব অথবা দ্রব্যমূল্য বা কর বৃদ্ধি হলে তার কত দুশ্চিন্তা হত। জনসাধারণের উপর সেসব ইস্যু প্রভাব ফেলে তার সবই তার রাজনৈতিক এজেন্ডার মধ্যে ছিল। যেমন কারাগারের রোজ নামচায় তিনি লিখেছেন,

খবরে কাগজে এসেছে.... সিলেটে বন্যায় দেড় লক্ষ লোক গৃহহীন ১০ জন মারা গেছে। কত যে গবাদি ভাসাইয়া নিয়া গেছে তার কি কোন সীমা আছে। কি করে এদেশের লোক তা ভাবতেও পারি না।... কতবার মানুষ দিবে। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শোয়েব সাহেব বলেছেন জনসাধারণ অধিকার সচ্ছল হইয়াছে। তাই কর ধার্য্য করেছেন। তিনি যাদের মুখপাত্র এবং যাদের স্বার্থে কাজ করেছেন তারা সচ্ছল হয়েছে। তাদের করে বোঝা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। শিল্পপতি ও বড় ব্যবসায়ীরা আনন্দিতই শুধু হয় নাই। প্রকাশ্যে মন্ত্রীকে মোবারকবাদ দিয়ে চলেছেন। আর জনগণ এ গণবিরোধী বাজেট যে গরীব মারার বাজেট বলে চিৎকার করতে শুরু করেছে। ১৯

সমাজে অনাদৃত ও বঞ্চিতদের প্রতি বঙ্গবন্ধুর বিশেষ সহমর্মিতা ছিল। **ÔKvivMv‡i †ivRbvgPvÕ** বইটিতে তিনি বিভিন্ন কয়েদিদের জীবন বৃত্তান্ত, দু:খ কষ্ট বর্ণনা করেছেন। বিশেষ করে পাগল কয়েদিদের প্রতি তাঁর মমতাবোধ আমরা লক্ষ্য করি।

এই বইটিতে তিনি লিখেছেনঃ

আমি মাঝে মাঝে বিড়ি কিনে পাগলদের দিতাম, বড় খুশি হতো বিড়ি পেলে। ২০

জেলের কর্মচারীদের সাথে তার সম্প্রীতি গড়ে উঠে। তিনি জেলে নিজ হাতে রান্না করেছেন, বাগান করেছেন। আওয়ামীলীগের অগণিত কর্মীদের ব্যক্তিগত সুখ দু:খেরও খবর রাখতেন।

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের অসুস্থতার কথা শুনে ১৯৭২ সালে ২১শে মে কবির ৭৩তম জন্মদিবসে ঢাকায় নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেন। বঙ্গবন্ধু কবিকে লিখেন, মুক্ত স্বাধীন ও স্বার্বভৌম বাংলাদেশের জনগন ও আমার পক্ষে আমি আপনাকে আমন্ত্রন জানাচ্ছি। আপনার আদর্শে বাংলাদেশকে সিক্ত হতে দিন। ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়ে কবি এসেছেন এক নতুন বাংলাদেশে। বঙ্গবন্ধু কবির থাকা খাওয়া ও সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করেন ও রাষ্ট্রীয়ভাবে তাকে এক হাজার টাকা ভাতা মঞ্জুর করেন। ২১

- **mgvRZš: †kvYnxb, †kvlbnxb, ˆelg¨nxb**

বঙ্গবন্ধু তার আত্মজীবনীতে লিখেছেন:

আমি নিজে কমিউনিষ্ট নই, তবে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করি এবং পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে বিশ্বাস করি না। একে আমি শোষনের যন্ত্র হিসেবে মনে করি। এ পুঁজিপতি সৃষ্টির অর্থনীতি যতদিন দুনিয়ায় থাকবে ততদিন দুনিয়ার মানুষের উপর থেকে শোষন বন্ধ হতে পারে না।

বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে প্রায়ই জনগণকে শোষন মুক্ত করে এক বৈষম্যহীন অর্থনৈতিক ও সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। সমাজতন্ত্র বলতে তিনি প্রধানত শোষণমুক্ত বৈষম্যহীন একটা ব্যবস্থার কথা ভাবতেন। ১৯৫২ সালে তিনি চীন যাবার পর চীন এবং পাকিস্তানের মধ্যে যে পার্থক্য সম্পর্কে তিনি দেখেছেন তা তার মনে গভীর দাগ কেটেছে। এই দুই দেশের পার্থক্য সম্পর্কে তিনি লিখেছেন;

তাদের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য হলো তাদের জনগণ জানতে পারল ও অনুভব করতে পারল এই দেশ ও এদেশের সম্পদ তাদের। আর আমাদের জনগণ বুঝতে আরম্ভ করল, জাতীয় সম্পদ বিশেষ গোষ্ঠীর আর তারা যে কেউই নন। ২২

শোষণ মুক্তি এবং বৈষম্যদূরীকরণে সরকারের যে দায়িত্ব আছে তা তিনি বিশ্বাস করতেন। চীন গিয়ে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন চীন সরকার জনসাধারণের জন্য কি কি কাজ করেছেন, সে দেশে প্রাধান্য পাচ্ছে শিল্প কারখানার উন্নতি, বিলাস দ্রব্য নয়। তিনি লিখেছেন,

ভূমিহীন কৃষক জমির মালিক হয়েছে। আজ চীন দেশ কৃষক মজুরের দেশ। শোষক শ্রেণী শেষ হয়ে গেছে। ২৩

***'কারাগারে রোজনামচা'** M‡š Zvi Rxeb cYvjx‡Z ˆelg¨nxb **বাস্তব** Rxe‡bi cwZ"Qwe d‡U D‡V|*

বঙ্গবন্ধু তাঁর শাসনকালের শেষ সময় বলেন, অর্থনৈতিক সিস্টেম (সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি) পরিবর্তন করেছি দু:খী মানুষের মুখে হাসি ফোটাবার জন্য। সিস্টেম পরিবর্তন করেছি, শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনবার জন্য। কথা হল, এমন অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে যে, অফিসে যেয়ে ব্যাংক থেকে টাকা নিয়ে যায়, সাইন করিয়ে নেয়। যেন দেশে সরকার নাই। আবদার করলাম আবেদন করলাম, অনুরোধ করলাম, কামনা করলাম কিন্তু কেউ কথা শোনে না। চোর নাহি শোনে ধর্মের কাহিনী।

তিনি আরও বলেন, ভাইয়েরা, বোনেরা আমরা আজকে যে সিস্টেম করেছি, তার আগেও ক্ষমতা বঙ্গবন্ধুর কম ছিল না। আমি বিশ্বাস করি ক্ষমতা বাংলার জনগণের কাছে। জনগণ যেদিন বলবে, 'বঙ্গবন্ধু ছেড়ে দাও'। বঙ্গবন্ধু তারপর একদিনও রাষ্ট্রপতি একদিনও প্রধানমন্ত্রী থাকবেনা। বঙ্গবন্ধু ক্ষমতার রাজনীতি করে নাই। বঙ্গবন্ধু রাজনীতি করেছে দু:খী মানুষকে ভালবেসে বঙ্গবন্ধু রাজনীতি করেছে শোষনহীন সমাজ কায়েম করার জন্য। ২৪

তাই শোষিতের গণতন্ত্র বাস্তবায়নে তিনি-১৯৭৫ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে সমবায়ের রুপকল্প তুলে ধরেন সেগুলো হচ্ছে,

১) বাধ্যতামূলক বহুমুখী গ্রাম সমবায় গঠন;

২) সমবায় ভিত্তিক যৌথ চাষ;

৩) কৃষিতে সর্বোচ্চ ভর্তুকি;

৪) মধ্যস্বত্বভোগী গ্রামীণ জোরদার, মহাজন, ধনিক বণিক শ্রেণীর উচ্ছেদ;

৫) উৎপাদন ব্যবস্থা ও উৎপাদন শক্তির বিকাশ সাধন;

৬) আমলাতন্ত্রের বিলুপ্তি এবং রাষ্ট্রীয় জীবনের ব্যাপক গণতন্ত্রায়ন গুরুত্বারোপ করে। ২৫

- **evsjv‡`k, gvbewaKvi I wek‡bZ‡Zi `ó‡Z e½eÜ :**

বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জনের পর মাত্র ১০ মাসের মাথায় বঙ্গবন্ধু যে সংবিধান উপহার দিয়েছেন তাঁর ২য় ভাগের ১১ নং অনুচ্ছেদে ১৯৪৮ সালের জাতিসংঘ ঘোষিত ৩০ টি অনুচ্ছেদ সংবলিত সার্বজনীন মানবাধিকার দর্শনের পুরোপুরি প্রতিফলন রয়েছে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, নিজ নিজ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন না করলে অধিকার বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়, সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করতে হলে সবাইকে দায়িত্ব সম্পাদন করতে হবে।

বঙ্গবন্ধু তার ভাষায় আমরা যদি একটু কষ্ট করি একটু বেশি পরিশ্রম করি সকলে সৎপথে সাধ্যমত নিজের দায়িত্ব পালন করি এবং সবচেয়ে বড় কথা সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে থাকি, তাহলে আমি বিনা দ্বিধায় বলতে পারি, ইনশাআল্লাহ কয়েক বছরেই আমাদের বাংলা আবার সোনার বাংলায় পরিণত হবে।

মানবাধিকারের অন্যতম দর্শন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে বঙ্গবন্ধু বিশ্বাসী ছিলেন। বাংলার মাটিতে সাম্প্রদায়িকতা স্থান পাবে না। এ বিষয়ে তার প্রত্যয় ছিল অবিচল। ১৯৪৬ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নিরসণের জন্য গান্ধী, সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গী হয়ে বাংলা বিহার উড়িষ্যাসহ সমগ্র ভারত সফর করেন।

বঙ্গবন্ধু বলতেন, এ রাষ্ট্রের মানুষ হবে সবার উপর মানুষ সত্য তাহার উপর নাই। তিনি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ধর্মকে ব্যবহারের বিরুদ্ধে ছিলেন। তার দৃষ্টিতে সকলধর্মের মানুষ সমঅধিকার দাবিদার। বাঙালিদের মানবাধিকার রক্ষায় তিনি ছিলেন পথিকৃৎ। তাইতো কিউবার মহান বিপ্লবী নেতা ১৯৭৩ সালে আলজেরিয়ায় রাজধানী আল জিয়ার্সে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের শীর্ষ সম্মেলনে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে সাক্ষাতের পর বলেছিলেন, *'আমি হিমালয় দেখিনি কিন্তু শেখ মুজিবকে দেখেছি। ব্যক্তিত্ব এবং সাহসিকতার তিনিই হিমালয়।'* ২৬

বঙ্গবন্ধু বিশ্বাস করতেন বিশ্বশান্তি তাঁর জীবনদর্শনের অন্যতম মূলনীতি। তিনি বলেন নিপীড়িত নির্যাতিত, শোষিত শান্তি ও স্বাধীনতাকামী সংগ্রামী মানুষ বিশ্বের যেকোন স্থানে হোক না কেন, তাহাদের সাথে আমি রহিয়াছি। তাঁহার এই মহান দর্শনের জন্য ২৩শে মে ১৯৭৩, এশীয় শান্তি সম্মেলনে 'জোলি ও কুরি' শান্তি পদকে ভূষিত হন।

wZwb e‡jb, ÔAvgiv PvB A¯ cwZ‡hvwMZvi e¨wqZ A_ `wbqvi `:Lx gvb‡li Kj¨v‡Yi Rb¨ wb‡qvM Kiv †nvKÕ| ২৭

3iv AvMó 1973 mv‡j Kgbl‡qj_ kxl m‡¤§j‡b e½eÜ e‡jb, *"আমরা শান্তির জন্য সর্বাত্মক প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।"*

পাকিস্থানের লাহোরে অনুষ্ঠিত ১৯৭৪ সালে ২ ফেব্রুয়ারী ওআইসি শীর্ষ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন, ধ্বংস নয় সৃষ্টি, যুদ্ধ নয় শান্তি। 28

Bqwmi Avivdv Z e½eÜ m¤ú‡K, *আপোষহীন সংগ্রামী নেতৃত্ব আর কুসুম কোমল হৃদয় ছিল মুজিব চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। ২৯*

আরব সাহিত্যের কবি আব্দুল হাফিজ লিখেছেন, আমি তার মধ্যে তিনটি গুণ মহৎ গুণ পেয়েছি- সেগুলো হলো দয়া, ক্ষমা ও দানশীলতা। ৩০

ইশ্বচন্দ্র বিদ্যাসাগর বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে বলেন, 'তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি মহৎ।' ৩১

weL¨vZ D` Kwe, blkv` bix তার টুঙ্গীপাড়া নামক কবিতার বঙ্গবন্ধু সম্বন্ধে এইভাবে বলেছেন-

'পথের শুরুটা হয়েছিল এইখানে,

পথ খোয়া গেল, হায় সেও এইখানে।'৩২

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আপাদমস্তক একজন বাঙালি ছিলেন। বঙ্গবন্ধুর যাপিত জীবন ছিল সহজ সরল। তিনি সব সময় সাদামাটা পোষাক পরিধান করতেন। বাহিরে পাজামা পাঞ্জাবী পরলেও ঘরে তাঁতের লুঙ্গী ও হাতকাটা গেঞ্জি পরিধান করতেন। তার ঘনিষ্ঠজন অনেকেই বলেছেন বঙ্গবন্ধু বাংলার চিরায়ত খাদ্য ভাত ও মাছ পছন্দ করতেন। সকালের নাস্তার পরিবর্তে পান্তাভাত ছিল তার প্রিয় খাবার।

*বঙ্গবন্ধু শুধুমাত্র কোন ঐতিহাসিক চরিত্র নয়, বরং মানুষের মুক্তি সংগ্রামের নির্ভীক যোদ্ধা। তিনি মানুষকে ভালবাসতেন। দু:খী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো ছিল তার রাজনীতির লক্ষ্য। তাইতো বিখ্যাত ব্রিটিশ সাংবাদিক ডেভিড ফ্রস্ট একবার বঙ্গবন্ধুকে প্রশ্ন করেছিলেন- **What is your Qualification?** বঙ্গবন্ধু সাথে সাথে বলেছিলেন, **I love my people.** সাংবাদিক ফ্রস্ট বঙ্গবন্ধুকে আবার প্রশ্ন করেছিলেন **What is your disqualification?** বঙ্গবন্ধু বললেন, **I love them too much.**৩৩*

Dcmsnvi: বঙ্গবন্ধু ছিলেন মানবতার মহান দূত। যৌবন থেকে শুরু করে জীবনের শেষ অবদি পর্যন্ত তিনি গরীব, অসহায় ও দুস্থ মানুষের মুখে হাসি ফোটানো ছিল তার জীবনের পরম লক্ষ্য। তিনি বিশ্বাস করতেন, বাংলার জনগণের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য রাজনৈতিক স্বাধীনতার কোন বিকল্প নেই। তাই যখনই তিনি পশ্চিম পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠী কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের প্রতি বৈষম্য ও বিমাতাসূলভ আচরণ লক্ষ্য করেছেন তখনই তাঁর প্রতিবাদ করেছেন। পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীর ধারণা ছিল বঙ্গবন্ধুকে যদি স্তব্ধ করা যায় তাহলে সকল আন্দোলন থামানো যাবে। যার ফলশ্রুতিতে যখন আন্দোলন সংগ্রাম তুঙ্গে উঠেছে তখন তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছে।

আজ বঙ্গবন্ধুর মানবতার দর্শন আমাদের সমাজে অনুপস্থিত। ধনী ও দারিদ্রের বৈষম্য আজ প্রকট। ধনী দিন দিন ধনী হচ্ছে আর দরিদ্র সীমার নীচে অসহায় মানুষের অবস্থান দীর্ঘায়িত হচ্ছে।

†KwfW-19 cwiw¯wZi কারণে এই পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হচ্ছে। **gvbbxq cavbgšx †kL nwmbv** পিতার যোগ্য উত্তরসূরী হিসেবে মানবতার মহান ব্রত নিয়ে এগিয়ে চলেছেন। একটি মানুষ যাতে অনাহারে না থাকে, গৃহহীন না থাকে সেই জন্য তিনি **GKwU ewo GKwU Lvgvi**, আশ্রয়ণ প্রকল্প-১,২, সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য ভাতার ব্যবস্থা করে, হতদরিদ্র লোকদের মুখে হাসি ফোটানোর চেষ্টা করছেন কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য কিছু স্বার্থন্বেষী মহল, তাঁর এই মহৎ উদ্দেশ্য যাতে কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে না পারে সেই জন্য নানা অনিয়ম, দূর্নীতি অর্থ লুটপাট, প্রকল্পের নামে মুনাফা লাভের নেশায় মগ্ন। **gvbbxq cavbgšx †kL nwmbvi miKvi** তৃতীয়বার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন হওয়ায় দুর্নীতির বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর ‘**wR‡iv Uj v‡iÝ bwZ**’ ঘোষণা করেছেন। অর্থনীতিবিদরা বলেছেন, দুর্নীতির কারণে প্রতি বছর ১৮ হাজার কোটি টাকার জিডিপি (মোট দেশজ উৎপাদন) হারাচ্ছে দেশ।

দুদকের চেয়ারম্যান, মন্ত্রী পরিষদ সচিব মোহাম্মদ শফিউল আলমের কাছে পাঠানো এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন, এটা প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতির প্রধান অন্তরায় দুর্নীতি। দুর্নীতি রোধ করা গেলে, প্রতিবছর দেশের জিডিপি ২ শতাংশ বাড়বে। পাসপোর্ট অফিস, বিআরটিএ, বিচারিক সেবা, ভূমি সেবা, শিক্ষাসেবা, স্বাস্থ্যসেবা ইত্যাদি সেবাখাত গুলোতে ঘুষ না দিলে কাঙ্খিত সেবা পাওয়া যায়না এ মানসিকতা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে সমাজে। এর ফলে দুর্নীতিকারীদের জবাবদিহিতার আওতায় আনা যাচ্ছেনা, ঘুষ ও দুর্নীতি মেনে নেওয়া জীবনের সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছে। যা বঙ্গবন্ধুর মানবতার দর্শনের পরিপন্থী।

বঙ্গবন্ধু ১০১ জন্ম বার্ষিকীতে আজ মনে হচ্ছে, বঙ্গবন্ধু জীবনকাল যতই বাড়ছে ততই নতুন নতুন তথ্য বঙ্গবন্ধুর যাপিত জীবনকে সমৃদ্ধ করছে।

weL¨vZ Kjwgó gnv¤§` Rvdi BKevj বঙ্গবন্ধুর উপর তাঁর স্মৃতিচারণে উল্লেখ করেন,

একটি মানুষ যে একটি দেশ হয়ে যেতে পারে, বঙ্গবন্ধুর জন্মের আগে পৃথিবীর কোন মানুষ কি সেটা জানত? এ মানুষটির জন্ম না হলে কি একটি লাল সবুজ পতাকা থাকত? আমার সোনার বাংলার মত একটি মধুর গান থাকত? সেই ষাটের দশকের এই সুপুরুষ সুদর্শন মানুষটি সারা দেশের পথে ঘাটে ঘুরে ঘুরে আমাদের বুকে একটি স্বপ্নের জন্ম দিয়েছিলেন। সেই স্বপ্ন এত তীব্র ছিল যে একাত্তরের গণহত্যার পরও দেশের মানুষ মাথা নোয়ায়নি, স্বাধীনতা সংগ্রাম করে এই দেশের জন্ম দিয়েছে। অথচ কী আশ্চর্য, একদিন মানুষটিকে সপরিবারে হত্যা করা হল। ৩৪

তাইতো **Ab`vk¼i ivq** লিখেছেন-

> ***"যতদিন রবে পদ্মা মেঘনা***
>
> ***গৌরী যমুনা বহমান***
>
> ***ততদিন রবে কীর্তি তোমার***
>
> ***শেখ মুজিবুর রহমান।"*** ৩৫

MšcÍÄ

১. মোনায়েম সরকার, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানঃ জীবন ও রাজনীতি প্রথম খন্ড, বাংলা একাডেমী ২০০৮, পৃষ্ঠা- ২৯

২. ভবেশ রায়, বঙ্গবন্ধুর জীবন কথা, ঢাকা এশিয়া পাবলিকেশন ১৯৯৬, পৃষ্ঠা- ১৭-১৮

৩. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অসমাপ্ত আত্মজীবনী ইউপি এন ফেব্রুয়ারী ২০১৬ পৃষ্ঠা নং-সূচী

৪. বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন ফর ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ এর প্রতিনিধি কর্তৃক গোপালগঞ্জ এলাকা থেকে সংগৃহীত তথ্য।

৫. অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃষ্ঠা নং- ০৯

৬. অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃষ্ঠা নং- ১০৬

৭. অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃষ্ঠা নং- ১০৪

৮. অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃষ্ঠা নং- ১০৬

৯. অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃষ্ঠা নং- ১১৪

১০. মোস্তফা মনওয়ার সুজন বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক মতবাদ উৎস প্রকাশনা,২০১৯ পৃষ্ঠা ৪২

১২. অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃষ্ঠা নং- ৮১

১৩. আ.আ.ম.স আরেফিন সিদ্দিকি সম্পাদিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, বাংলা একাডেমী ২০১৭ পৃষ্ঠা-১৪

১৪. ২০ শে ডিসেম্বর ২০২০ যুগান্তর,

১৫. বঙ্গবন্ধুর এতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ অনলাইন থেকে সংগ্রহীত।

১৬. কারাগারে রোজনামচা পৃষ্ঠা নং -৩৫

১৭. বঙ্গবন্ধুর এতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ অনলাইন থেকে সংগ্রহীত।

১৮. প্রফেসর ড. রওনক জাহান, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক চিন্তাধারা পৃষ্ঠা নং- ১১

১৮. কারাগারে রোজনামচা পৃষ্ঠা নং -৩৬

১৯. কারাগারে রোজনামচা- পৃষ্ঠা-৩৫

২০. কারাগারে রোজনামচা-১৮৯

২১. দৈনিক বাংলা ২৫ শে মে ১৯৭

২২. প্রাগুক্ত- পৃষ্ঠা নং-১৩৯

২৩. অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃষ্ঠা নং- ২৩৪

২৪. মোস্তফা মনোয়ার সুজন পৃষ্ঠা- ৪২

২৫. প্রাগুক্ত- পৃষ্ঠা নং-১৩৯

২৬. দৈনিক ইত্তেফাক ৪ঠা আগষ্ট ১৯৭৩

২৭. দৈনিক ইত্তেফাক ২৪শে মে ১৯৭৩

২৮. দৈনিক ইত্তেফাক ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪

২৯. অনলাইন থেকে সংগৃহীত ১১ মার্চ ২০২১, বিডিনিউজ২৪

৩০. অনলাইন থেকে সংগৃহীত ১১ মার্চ ২০২১, বিডিনিউজ২৪

৩১. অনলাইন থেকে সংগৃহীত ১১ মার্চ ২০২১, বিডিনিউজ২৪

৩২. অনলাইন থেকে সংগৃহীত ১১ মার্চ ২০২১, বিডিনিউজ২৪

৩৩. অনলাইন থেকে সংগৃহীত, বঙ্গবন্ধুর সাক্ষাৎকার, ১১ জানুয়ারি ১৯৭২

৩৪. শাহজাহান কিবরিয়া সম্পাদিত, গদ্যে পদ্যে বঙ্গবন্ধু, একজন বঙ্গবন্ধু, একটি দেশ, পৃষ্ঠা নং -২১৭

৩৫. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং-৭১